আলোচ্য আয়াতে তাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে---যাতে আল্লাহ্‌র রজ্জু তার হাত থেকে ফস্‌কে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, হাত থেকে ফস্‌কে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে। এর ফল হবে এই যে, সবাই মিলে আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে এবং পরিণামে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ তাদের করায়ত্ত থাকবে। প্রত্যেক মুসলমানের কাঁধে অপরকে সংশোধন করার এ দায়িত্ব অর্পণের জন্য কোরআন মজীদে অনেক সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণিত হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরা সর্বোত্তম সম্প্রদায়, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"

এতেও গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর, 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এবং একেই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বহু নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজাহ্‌র রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ

والذى نفسى بيده لتأمرونّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر اوليوشكنّ الله ان يبعث عليكم عقابًا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم -

অর্থাৎ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম---তোমরা অবশ্যই 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক। নতুবা সত্বরই আল্লাহ্‌ পাপীদের সাথে সাথে তোমাদের সবার জন্যই শাস্তি প্রেরণ করতে পারেন। তখন তোমরা দোয়া করলেও কবুল হবে না।' অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দেবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তত মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

উপরোক্ত আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, 'সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের মত এতেও প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্য ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য এ দায়িত্ব তার প্রতি ততটুকুই আরোপিত হবে। উপরোক্ত হাদীসে সামর্থ্যের ওপরই এ দায়িত্ব নির্ভরশীল রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক কাজের সাধ্য ও সামর্থ্য ভিন্ন হয়ে থাকে। সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সামর্থ্য সর্বপ্রথম যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে সৎ ও অসতের বিশুদ্ধ জ্ঞান। যে ব্যক্তি নিজেই সৎ ও অসতের পরিচয় জানে না অথবা এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয়, সে অপরকে 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করতে শুরু করলে হিতে বিপরীত না হয়ে পারে না। সে অজ্ঞতার কারণে হয়ত কোন সৎ কাজে নিষেধ এবং কোন অসৎ কাজে আদেশ করে ফেলতে পারে। এ কারণে সৎ ও অসৎ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তাদের প্রথম কর্তব্য হবে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর তদনুযায়ী 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' সংক্রান্ত কর্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়া।

কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে এ কাজে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়। আজকাল অনেক মূর্খ লোক ওয়ায করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। অনেক সাধারণ লোকও শোনা কথাকে সম্বল করে অপরের সাথে তর্ক জুড়ে দেয়। এহেন প্রবণতা সমাজকে সংশোধিত করার পরিবর্তে অধিকতর ধ্বংস ও কলহ-বিবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর সামর্থ্যের মধ্যে অসহনীয় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, পাপ কাজ হাত ও শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য না থাকলে মুখে বাধা দেবে এবং মুখে বাধা দেওবার সামর্থ্য না থাকলে অন্তর দ্বারাই ঘৃণা করবে। এখানে জানা কথা যে, মুখে বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকার অর্থ বাকশক্তি রহিত হয়ে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ হলো সত্য কথা বলতে গেলে প্রাণ নাশের আশংকা থাকা অথবা অন্য কোন মারাত্মক ক্ষতির আশংকা থাকা। এমতাবস্থায় 'সামর্থ্য নেই' বলা হবে এবং 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'—এর কর্তব্য পালন না করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোনাহ্গার মনে করা হবে না। তবে আল্লাহ্র পথে স্বীয় জানমালের পরওয়া না করলে এবং ক্ষতি স্বীকার করে নিলে তা ভিন্ন কথা। এরূপ ঘটনা অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষীর কার্যাবলীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্র কাছে এহেন দুঃসাহসিকতার কারণেই তাঁরা ইহকাল ও পরকালে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু এরূপ করা তাঁদের উপর ফরয বা ওয়াজিব কিছুই ছিল না।

সূরা 'ওয়াল-আসরের' আয়াত, আলোচ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা মুসলিম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সামর্থ্যানুযায়ী 'সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধাদান'কে ওয়াজিব করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিশদ বর্ণনা এই যে, ওয়াজিব কাজের বেলায় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব কাজের ক্ষেত্রে তা মুস্তাহাব। উদাহরণত পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। সুতরাং বেনামাযীকে নামাযের আদেশ করা প্রত্যেকের উপর ফরয। নফল নামায মুস্তাহাব; এর জন্য উপদেশ দেওয়াও মুস্তাহাব। এছাড়া আরেকটি জরুরী শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হল এই যে, মুস্তাহাব কাজের বেলায় সর্বাবস্থায় নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে এবং ওয়াজিব কাজের বেলায় প্রথমে নম্রতার সাথে এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ারও অবকাশ আছে। অথচ আজকাল মুস্তাহাব ও মুবাহ্ কাজের বেলায় বেশ কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু ওয়াজিব ও ফরয পালন না করলে কেউ টু শব্দটিও করে না।

এছাড়া 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করণের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখবে। উদাহরণত কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে, তা ওয়াজিব নয়; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে।

নবী করীম (সা)-এর من رأى منكم- উক্তিতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে, এতে 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসৎ কাজ হতে দেখে' বলা হয়েছে।

'সৎ কাজে আদেশ'-এর দ্বিতীয় পর্যায় হলো মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি দল বিশেষভাবে তবলীগের কাজেই নিয়োজিত থাকবে। তাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা মানুষকে কোরআন ও সুন্নাহ্র দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে সৎ কাজে উদাসীন ও অসৎ কাজে আগ্রহী দেখলে সাধ্যানুযায়ী সৎ কাজের দিকে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' করার দায়িত্ব ও কর্তব্যটি পুরোপুরি পালন করার জন্য মাস'আলা-মাসায়েলের পূর্ণ জ্ঞান এবং সুন্নাহ অনুযায়ী তার নিয়ম-নীতি জানা পূর্বশর্ত। তাই এ কর্তব্যটি পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য মুসলমানদের একটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন সম্প্রদায়কে এ কাজে আদিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রকাশ করে বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় থাকা জরুরী, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজে আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ বলেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরূপ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুবই জরুরী। যদি কোন সরকার এ কর্তব্য সম্পাদন না করে, তবে এরূপ সম্প্রদায় গঠন করা মুসলমান জনগণের ওপরই ফরয। কারণ, যতদিন এ সম্প্রদায় কায়েম থাকবে ততদিনই তাদের জাতীয় জীবন নিরাপদ থাকবে। অতঃপর এ সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান গুণ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

অর্থাৎ এ সম্প্রদায়ের প্রথম বৈশিষ্ট্যমূলক স্বাতন্ত্র্য হতে হবে এই যে, তারা خير বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং এটাই হবে তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। 'খায়র' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الخير هو اتباع القران وسنتى

অর্থাৎ 'খায়র'-এর অর্থ হলো কোরআন এবং আমার সুন্নাহ্র অনুসরণ করা।

---(ইবনে কাসীর)

'খায়র' শব্দের এর চাইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টি হতে পারে না। সমগ্র শরীয়ত এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর يدعون-কে مضارع ক্রিয়াপদে ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, কল্যাণের প্রতি আহ্বানের অব্যাহত প্রচেষ্টাই হবে এ সম্প্রদায়ের কর্তব্য।

'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' বাক্যের দ্বারা এরূপ বোঝার সম্ভাবনা ছিল যে, এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ যখন চোখের সামনে অসৎ কাজ হতে দেখা যায়। কিন্তু يدعون الى الخير বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা; তখন অসৎ কাজ হতে দেখা যাক বা না যাক অথবা কোন ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণত সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোট কথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করতে থাকা।

কল্যাণের প্রতি আহ্বানেরও দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর অ-মুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে।

মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও। সে মতে জিহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ তারা সাচ্চা মুসলমান, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে---যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা স্বীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তবে বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দূর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ولتكن منكم আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন ঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের দল।---(ইবনে জারীর) কেননা তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহ্বান করা। অর্থাৎ সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লিখিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে, প্রচারকার্য চালাবে। এ আহ্বানও দুই প্রকার। একটি ব্যাপক আহ্বান, অর্থাৎ সব মুসলমানকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ আহ্বান। অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। অপর একটি আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

---"প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেন দীনী ইল্‌মে বিশেষ জ্ঞান অর্জন

করার জন্য বের হয়ে আসে না, যেন তারা ফিরে এসে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে এবং এভাবেই তারা হয়ত সাবধানী জীবন অবলম্বন করতে সমর্থ হবে।"

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছে ঃ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ — অর্থাৎ তারা সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লিখিত 'মারূফ'-এর (সৎ কর্মের) অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লিখিত 'মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজেবাত' (জরুরী করণীয় কাজ) ও 'মাআসী' (গোনাহ্র কাজ)-এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতিহাদী মাস'আলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাস'আলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানীং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়। আজকাল ইজতিহাদী মাস'আলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্বরহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গোনাহ্র কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। আয়াতের শেষাংশে এ আহ্বানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ — অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য।

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে-কিরামের দল। তাঁরা কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ-এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন; রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করেন; বিশ্বকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা দেন এবং পুণ্য ও আল্লাহ্ভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ -

অর্থাৎ তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পরে মতবিরোধ করেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا আয়াতের পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াতে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধতা সমগ্র জাতিকে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' দ্বারা এ ঐক্যবদ্ধতাকে শক্তিশালী এবং লালন করা হয়েছে। এরপর وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ এবং وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।

আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা দীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে "উজ্জ্বল নির্দেশাবলী আসার পর" বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দীনের মূলনীতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখাপ্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে যদি ইজতিহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লিখিত নিন্দার আওতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ যদি কেউ ইজতিহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করে তবু একটি সওয়াব পাবে।

এতে বোঝা যায় যে, ইজতিহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতিহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোনো না

কোনো পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ বলেনঃ সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্য রহমত ও মুক্তির কারণস্বরূপ। —(রুহুল-মাআনী)

ইজতিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েয নয়ঃ এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়তসম্মত ইজতিহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতিহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতিহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতিহাদী মতবিরোধে কারও এ কথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক ; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার আশংকাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত ; কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতি কথাটি ইমাম ও ফিকহ্বিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইজতিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালিগালাজ করতেও কুন্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতিহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতিহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে? আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককেই দীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া, মারামারি ও গালিগালাজ পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ কর্মপন্থা অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী। পূর্ববর্তী মনীষিগণের মধ্যে ইজতিহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায় নাই। উদাহরণত ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন মুজতাহিদের মতে জামাতের নামায ইমামের পেছনে মুক্তাদিগণও নিজে-নিজে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার নামাযই হবে না। এর বিপরীতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফীগণ ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের কোথাও দেখা যায় না যে, শাফেয়ী মাযহাবের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের মুসলমানগণকে বেনামাযী বলেছেন বা শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলী আখ্যায়িত করে তাদের এ মতবাদকে নাকচ করে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আবদুল বার 'জামেউল-ইল্‌ম' গ্রন্থে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা বর্ণনা করেন ঃ

عن يحيى بن سعيد قال ما برح اهل الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه -

অর্থাৎ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন ঃ ফতোয়াদাতা আলেমগণ বরাবর ফতোয়া দিয়ে আসছেন। একজন হয়তো ইজতিহাদের মাধ্যমে এক বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন এবং অন্যজন হয়তো সেটা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হারাম ফতোয়াদাতা এরূপ মনে করেন না যে, যিনি হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন এবং হালাল ফতোয়াদাতাও এরূপ মনে করেন না যে, যিনি হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

একটি জরুরী হুঁশিয়ারি ঃ এ প্রসঙ্গে ইজতিহাদের নীতিমালা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। ইজতিহাদের প্রথম শর্ত এই যে, যেসব মাস'আলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন মীমাংসা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তা এমন অস্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে অথবা একাধিক আয়াত ও হাদীস থেকে পরস্পর-বিরোধী বিষয় বোঝা যায়, শুধু এ জাতীয় মাস'আলা সম্পর্কেই ইজতিহাদ করা যেতে পারে।

যে কেউ ইজতিহাদ করতে পারে না ; বরং এ জন্যও কয়েকটি শর্ত রয়েছে। উদাহরণত কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে পুরোপুরি দক্ষ হওয়া, আরবী ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া, সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের উক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ইত্যাদি। অতএব, যে মাস'আলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে মীমাংসা রয়েছে, সে মাস'আলায় কেউ নিজস্ব মত প্রকাশ করলে তা ইজতিহাদী মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং নিন্দনীয় হবে।

এমনিভাবে ইজতিহাদের শর্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার যোগ্য নয়, তার মতবিরোধকে ইজতিহাদী মতবিরোধ বলা হয় না। সংশ্লিষ্ট মাস'আলায় তার উক্তির কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। ইসলামের ইজতিহাদও একটি স্বীকৃত মূলনীতি--- এ কথা শুনে আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক এমন বিষয়েও মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে, যে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে মীমাংসা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব মুজতাহিদ ইমামেরও কথা বলার অধিকার নেই। ---(নাউযুবিল্লাহ্)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ ۝ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ

اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٨﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ
وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١١٠﴾

(১০৬) সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো—বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে,—তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ যা তোমাদেরকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না। (১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ঐ দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) কতক মুখ শুভ্র (ও উজ্জ্বল) হবে এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কালো (ও অন্ধকারময়)। যাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হবে তাদের বলা হবে ঃ তোমরা কি বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছিলে? অতএব (এখন) শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাসী হয়েছিলে। আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। এগুলো (যা উল্লিখিত হলো) আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন---যা আমি বিশুদ্ধরূপে আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাই। (এতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতাই বোঝা যাচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না। (কাজেই যার জন্য যে পুরস্কার ও শাস্তি ঘোষণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। এতে পুরস্কার ও শাস্তির ন্যায়ভিত্তিক হওয়াই প্রতিফলিত হয়েছে)। যাকিছু নভোমণ্ডলে রয়েছে এবং যাকিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে সবই আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। (সুতরাং যখন তাঁরই মালিকানাধীন, তখন তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। এতে সবার গোলাম হওয়া ও আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হলো)। আল্লাহ্‌র দিকেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কেউ ক্ষমতাসীন হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ ঃ মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণত ঃ

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ـ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ দেখতে পাবেন। ---(সূরা যুমার)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَّ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

অর্থাৎ বহু চেহারা সেদিন হাস্যোজ্জ্বল হবে; হাসি ও আনন্দে ভরপুর। আর কতই না চেহারা সেদিন ধূলিমলিন হয়ে পড়বে! ---(আবাসা)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

অর্থাৎ সেদিন তো অনেক চেহারাই উজ্জ্বল হবে---তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকেই চেয়ে থাকবে। ---(সূরা কিয়ামাহ্)

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উজ্জ্বল, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কুফরের কালো বর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা? ঃ এরা কারা---এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা (রা) বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমণ্ডল কালো হবে। ---(কুরতুবী)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

فقال ابو امامة كلاب النار شر قتلى تحت اديم السماء وخير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ـ

আবু উমামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন ঃ হাদীসটি যদি অন্তত সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না। —(তিরমিযী)

হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ যারা হুযুর (সা)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। —(কুরতুবী)

এছাড়া আরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোর মর্মার্থই এক। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ একমাত্র খাঁটি মু'মিনদের মুখমণ্ডলই সাদা হবে। যারা ধর্মে পরিবর্তন সাধন করে, এরপর কাফির হয়ে যায় কিংবা অন্তরে কপটতা রাখে, তাদের মুখমণ্ডল কালো হবে।

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। এক—আল্লাহ্ তা'আলা يوم تبيض وجوه وتسود وجوه বাক্যে প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ —বাক্যে বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেওয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের যোগ্য; অতঃপর মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ এরা আল্লাহ্‌র শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِي رَحْمَةِ اللهِ বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানব জাতিকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুই—শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্‌প্রদত্ত সামর্থ্যের

বলেই মানুষ ইবাদত করে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

—(তফসীরে-কবীর)

তিন—আল্লাহ্ তা'আলা فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যাংশের পর هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে না---বরং সর্বকালীন হবে। এ নিয়ামত কখনো বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল-বিশিষ্টদের জন্য একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গোনাহের শাস্তিই লাভ করে ঃ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ—আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের শেষাংশে আরও বলেছেন ঃ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেওয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবী হিসেবেই দেওয়া হয়।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝١١٠

(১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো,

তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে এবং 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ' করার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশটিকে অধিকতর জোরদার করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সম্প্রদায়কে জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মতগণ!) তোমরাই মানবমণ্ডলীর (হেদায়েতের উপকারের) জন্যে সমুত্থিত শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়। (উপকার করাই এ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই উপকারের ধরন এই যে,) তোমরা (শরীয়তানুযায়ী অধিক যত্নসহকারে) সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর (নিজেরাও) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (অর্থাৎ বিশ্বাসে অটল থাকবে। এখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণিত যাবতীয় আকীদা ও আমল 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস'-এর অন্তর্ভুক্ত)। যদি আহলে কিতাবগণ (---যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, তারা যদি তোমাদের ন্যায়) বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো। (অর্থাৎ তারাও সত্যপন্থীদের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তারা সবাই মুসলমান হয়নি; বরং) তাদের কেউ বিশ্বাসী, (যারা রসূলুল্লাহ্ [সা]-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে) এবং অধিকাংশই অবিশ্বাসী (রসূলুল্লাহ্ [সা]-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ ঃ মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। ---(মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থেই সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎ কাজে

আদেশ দান এবং অসৎ কাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণতালাভ করেছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে'র কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জিহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর 'ন্যায়' সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে মহানবী (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে—যারা 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ—বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গম্বর ও উম্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেওয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহ্লে-কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ মু'মিন। বলা বাহুল্য, এঁরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾

(১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণের সাথে আহ্লে-কিতাবগণের শত্রুতা এবং মুসলমানগণের ধর্মীয় ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের পার্থিব ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ আহ্লে-কিতাবগণ) তোমাদের (মৌখিক ভালমন্দ বলে অন্তরে)

সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা (এর বেশী ক্ষতি করার দুঃসাহস করে এবং) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যাবে। অতঃপর (আরও বিপদ হবে এই যে,) কোন দিক থেকে তাদের সাহায্য করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে-কিরামের সাথে নবুয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদীরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের ওপর জিযিরা কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ
مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

(১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। তাদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ তারা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু (দুই উপায়ে তারা এ লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। [এক] এমন উপায়ে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং [দুই] এমন উপায়ে,) যা মানুষের পক্ষ থেকে। (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপায় এই যে, কোন আহ্‌লে-কিতাব অমুসলিম যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে এবং নিজ ধর্মমতে ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তবে জিহাদে মুসলমানরা তাকে হত্যা করবে না —যদিও তার কাফিরসুলভ সে ইবাদত পরকালে কোন

উপকারে আসবে না। এমনিভাবে কোন আহলে-কিতাব নাবালেগ অথবা স্ত্রীলোক হলে ইসলামী শরীয়তের আইন তাকেও জিহাদে হত্যা করার অনুমতি নেই। মানুষের পক্ষ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, আহলে-কিতাবরা যদি মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে, তবে শরীয়তের আইন অনুযায়ী তারা নিরাপদ হয়ে যাবে—তাদের হত্যা করা জায়েয নয়)। তারা আল্লাহ্‌র কোপের যোগ্য হয়ে গেছে। তাদের জন্য দারিদ্র্য অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তারা সাহসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। এ ছাড়া জিযিয়া ও খেরাজ দিয়ে বসবাস করাও দারিদ্র্য, গলগ্রহতা এবং অধঃপতনেরই লক্ষণ)। এগুলো (অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও কোপ) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অস্বীকার করেছে এবং পয়গম্বরগণকে (তাদের জ্ঞান মতেও) অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। (এই লাঞ্ছনা ও কোপ) এই কারণে (ও) যে, তারা আনুগত্য করেনি, বরং আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থঃ সূরা বাক্বারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে।—(মা'আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশ্‌শাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। এক, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। উদাহরণত নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। দুই, بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না। بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফির উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে। বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যা কিছু শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর ওপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। (والله اعلم)

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ
الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ
وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ
وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ
فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

(১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ে নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সৎ কাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ্‌ পরহিযগারদের বিষয়ে অবগত। (১১৬) নিশ্চয় যারা কাফির হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী—তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেতে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাদের উপর কোন অন্যায় করেন নি—কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আহ্‌লে-কিতাবদের কিছু সংখ্যক মুসলমান এবং বেশীর ভাগ কাফির। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়বস্তুরই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (আহ্‌লে-কিতাবরা) সব সমান নয়। (বরং) আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যেই এক দল রয়েছে, যারা (সত্যধর্মে) প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোর-আন) রাত্রিবেলায় পাঠ করে এবং নামাযও পড়ে। তারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি (পুরোপুরি) বিশ্বাস রাখে এবং (অপরকে) সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে তৎপরতা প্রদর্শন করে। এরা আল্লাহ্‌র কাছে সৎ কর্ম-শীলদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যেসব সৎ কর্ম করবে তা থেকে (অর্থাৎ তার সওয়াব থেকে) তাদের বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পরহিযগারদের সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত রয়েছেন। (তারা যেহেতু পরহিযগার, তাই ওয়াদা অনুযায়ী পুরস্কারের যোগ্য)। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র (শাস্তির) মোকাবিলায় বিন্দুমাত্রও ফলপ্রদ হবে না। তারা দোযখের অধিবাসী—তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে (কখনও মুক্তি পাবে না)। তারা (কাফিররা) পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত (নিষ্ফল ও বরবাদ হওয়ার ব্যাপারে) ঐ বাতাসের অনুরূপ, যাতে প্রবল শৈত্য (অর্থাৎ তুষার) থাকে, বাতাসটি ঐ সব লোকের শস্যক্ষেত্রে লাগে যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। অতঃপর তা (বাতাসটি) একে (অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রকে) ধ্বংস করে দেয়। (এমনিভাবে তাদের ব্যয়ও পরকালে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংস করার ব্যাপারে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (কোন) অন্যায় করেন নি ; বরং তারা স্বয়ং (কুফর করে—যা কবুল হতে দেয় না) নিজেদের ক্ষতি করছিল। (তারা কুফর না করলে তাদের ব্যয় নিষ্ফল হতো না)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ
خَبَالًا ۭ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۗءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ
وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰٓاَنْتُمْ اُولَاۗءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ
بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ
الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۭ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ۝ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
يَّفْرَحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـــًٔا ۭ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١١٨﴾

(১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না—তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৯) দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে—'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর রোষবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশেই মরতে থাক। আল্লাহ্ মনের কথা ভালই জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই—তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের (লোক) ব্যতীত (অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে) কাউকে (মিত্রসুলভ আচরণে) ঘনিষ্ঠ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। (কেননা,) তারা তোমাদের সাথে অঘটন ঘটাতে কোন ত্রুটি করবে না। তারা (মনে প্রাণেও) তোমাদের (পার্থিব ও ধর্মীয়) ক্ষতি কামনা করে। (তোমাদের প্রতি শত্রুতায়) তাদের মন এতই ভরপুর যে, (মাঝে মাঝে) তাদের মুখ থেকেও (অনিচ্ছাকৃত কথাবার্তায়) শত্রুতা বের হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে, তা আরও গুরুতর। আমি (তাদের শত্রুতার) লক্ষণাদি তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছি। যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক (তবে এসব নিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা বুঝে নাও)। শোন, তোমরা তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও ভালবাসা রাখে না (অন্তরেও না এবং বাহ্যিক ব্যবহারেও না)। আর তোমরা সব (খোদায়ী) গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখ। (তাদের গ্রন্থও এ সবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তোমাদের এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা তোমাদের প্রতি ভালবাসা রাখে না, অথচ তোমরা তাদের এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের প্রতি ভালবাসা রাখ। তাদের বাহ্যিক দাবী শুনে তোমরা মনে করো না যে, তারা তোমাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে। কেননা,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন (শুধু তোমাদের দেখাবার জন্য কপটতার সাথে) বলে: আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন (তোমাদের

কাছ থেকে) পৃথক হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙুল কামড়াতে থাকে (এটা তীব্র ক্রোধের পরিচায়ক)। আপনি (তাদের) বলে দিনঃ তোমরা স্বীয় আক্রোশে মরে যাও (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মরে গেলেও তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা গভীরভাবে অবগত আছেন। (এ কারণেই তাদের মনের দুঃখ, হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। তাদের অবস্থা এই যে, যদি তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হও, (উদাহরণত তোমরা যদি পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও, শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ কর ইত্যাদি) তবে তারা অসন্তুষ্ট হয় (তীব্র হিংসাই এর কারণ)। আর যদি তোমরা অমঙ্গলজনক অবস্থার সম্মুখীন হও, তবে তারা (খুব) আনন্দিত হয়। (তাদের অবস্থা যখন এরূপ, তখন তারা বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের যোগ্য কি করে হবে? তাদের উল্লিখিত অবস্থাদৃষ্টে এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক ছিল না যে, মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে তারা কোন ত্রুটি করবে না। তাই পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য বলেনঃ) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। (তোমরা নিশ্চিন্ত থাকলে দুনিয়াতে তারা অকৃতকার্য হবে এবং পরকালে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কর্ম-কাণ্ডকে (জানার দিক দিয়ে) বেষ্টন করে আছেন। (তাদের কোন কাজ আল্লাহ্র অজানা নয়। কাজেই পরকালে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার কোনই উপায় নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুলঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদীদের সাথে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত ও গোত্রগত—উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদীদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের লোকেরা ইহুদী বন্ধুদের সাথে ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইহুদীদের মনে ছিল মহানবী (সা) ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোন ব্যক্তিকে আন্তরিকতার সাথে ভালবাসতে সম্মত ছিল না, যে এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যত পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিসংবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে এবং তাদের দলগত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করতো। আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের এহেন দুরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ—অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ

করো না। بطانة শব্দের অর্থ, অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بطانة বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بطن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظهر। কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظهر এবং অভ্যন্তরীণ দিককে بطن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظِهَارَةٌ এবং ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে بطانة বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি ঃ সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে بطانة বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'লিসানুল-আরাব'-এ بطانة শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে ঃ

بطانة الرجل صاحب سره وداخلة امره الذى يشاوره فى احواله -

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بطانة বলা হয়। আল্লামা ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআন গ্রন্থে এবং কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই লিখেছেন। এর সারমর্ম এই যে, যাকে বিশ্বস্ত, অভিভাবক ও বন্ধু মনে করা হয় এবং নিজ কাজ-কারবারে যাকে উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করা হয়, তাকেই بطانة বলা হয়।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী স্বীয় করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি—উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি—উভয়েরই হিফাযত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من اذى ذميًّا فانا خصمه ومن كنتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يوم القيامة ـ

—যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

منعنى ربى ان اظلم معاهدا ولا غيره—অর্থাৎ—কোন চুক্তি-বদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন। আর এক হাদীসে বলেন ঃ

الا من ظلم معاهدًا او انتقصه او كلّفه فوق طاقته او اخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة ٥

অর্থাৎ সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হিফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তি-গত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। হযরত উমর ফারূক (রা) উত্তরে বলেন ঃ

قد اتخذت اذًا بطانة من دون المؤمنين—অর্থাৎ এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

قد انقلبت الاحوال فى هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء وتسودوا بذلك عند جهلة الاغنياء من الولاة والامراء ـ

অর্থাৎ আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে তারা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসছে।

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়—এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করা হয় না।

রাশিয়া ও চীনে কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না---এমন কোন ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হয় না। এমন কাউকে রাষ্ট্রের উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পতনের কাহিনী পাঠ করলে পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও দেখা যাবে যে, মুসলমানরা নিজস্ব কাজকর্মে অমুসলিমদের বিশ্বস্ত আমলা, উপদেষ্টা এবং অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের মূলেও এ কারণটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার!

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খৃস্টান কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক কেউ তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন-না-কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুকায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ—বাক্যটি কাফিরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে ... هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের ভালবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে ঃ আমরা

মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু! আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নেই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে তাদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফিরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটি সহজলভ্য ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে ঃ

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহিযগারী অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।

ধৈর্য ও পরহিযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য ঃ যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কোরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহিযগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসাবে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য রুকূর পরবর্তী রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

—"হ্যাঁ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, পরহিযগার হও এবং শত্রুসৈন্য তোমাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা

দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এখানে ধৈর্য ও তাকওয়ার উপরই অদৃশ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। সূরা ইউসুফে বলা হয়েছেঃ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ এখানেও ধৈর্য ও পরহিযগারীর সাথে সাফল্যকে জড়িত করা হয়েছে। আলোচ্য সূরার শেষভাগে এভাবে ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর, সহিষ্ণু ও সুসংগঠিত হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলকাম হও। এতে ধৈর্য ও খোদাভীতির ওপর সাফল্যকে নির্ভরশীল বলা হয়েছে।

ধৈর্য ও তাকওয়া দুটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম! কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি বিভাগ এবং সাধারণ ও সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলার একটি চমৎকার নীতি পূর্ণাঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাদীসে আছেঃ

عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا علم اية لو اخذ الناس بها لكفتهم و من يتق الله يجعل له مخرجًا الا ية -

অর্থাৎ আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি মানুষ একে অবলম্বন করে তবে ইহকাল ও পরকালের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটি এইঃ و من يتق الله يجعل له مخرجًا —যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِذْ هَمَّتْ طَّاۗىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۭ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(১২১) আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে— মু'মিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই শুনেন এবং জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা মু'মিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, মুসলমানরা ধৈর্য ও তাকওয়ার পথে অটল থাকলে কোন শক্তিই তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যে সাময়িক পরাজয় ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তা কিছু সংখ্যক লোকের সাময়িক বিচ্যুতির কারণেই হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা ও বদর যুদ্ধের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আপনি (যুদ্ধের দিনের পূর্বে) মুসলমানদেরকে (কাফিরদের সাথে) যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য সকাল বেলায় ঘর থেকে বের হয়েছিলেন (অতঃপর সবাইকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করে দিয়েছিলেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (তখনকার কথাবার্তা) শুনছিলেন (এবং তখনকার) সব অবস্থা জানছিলেন। (এর সাথে এ ঘটনাটিও ঘটে যে) তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে দুটি দল (বনী সালমা ও বনী হারেসা গোত্রদ্বয়) ভীরুতা প্রদর্শনের সংকল্প করে (যে আমরাও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের মত নিজ গৃহে ফিরে যাবো)। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুই দলের সাহায্যকারী ছিলেন। (তাই তাদেরকে ভীরুতা প্রদর্শন করতে দেন নি। তিনিই তাদেরকে এ সংকল্প কার্যে পরিণত করা থেকে বিরত রাখেন। ভবিষ্যতের জন্যও আমি সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা যখন মুসলমান, তখন) মুসলমানদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করাই উচিত (এবং এমন কাপুরুষতা প্রদর্শন করা উচিত নয়)। এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন। অথচ তোমরা (তখন একেবারেই) দুর্বল ছিলে। (কেননা, কাফিরদের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা কম ছিল। তারা ছিল এক হাজার আর মুসলমানরা ছিল মাত্র তিনশত তেরো। অস্ত্রশস্ত্রও ছিল অনেক কম)। অতএব (ধৈর্য ও খোদাভীতির বদৌলতেই যখন আল্লাহ্র সাহায্য পেয়েছিলে, তখন ভবিষ্যতের জন্য) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর—যাতে তোমরা (এ অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞ হও। (কেননা, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা হয় না; বরং মুখ ও অন্তর উভয়টির সমন্বয়েই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হয়। তৎসঙ্গে যথারীতি ইবাদতও হওয়া দরকার। এ অনুগ্রহ লাভে ইবাদতের প্রভাবও প্রমাণিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমিকা ঃ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কুরায়শ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরায়শদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় এবং সমসংখ্যক কুরায়শ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কুরায়শদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করলো, আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই এ অভিযানে ব্যয় করা হোক---যাতে আমরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কুরায়শদের সাথে অন্যান্য আরব গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো---যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন-চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রুশক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বাহ্যত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযুর (সা)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন ঃ একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্র ধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পয়গম্বর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী (সা) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শমত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন

আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুযুরে আকরাম (সা) সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য স্থাপন করলেন যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পেছনের দিকে। তিনি হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র (রা)-এর হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রা)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযা (রা)-র হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পণ করলেন। পশ্চাদ্‌দিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন পশ্চাদ্‌দিকে টিলার ওপর থেকে হিফাযতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তাঁরা স্থানচ্যুত হবেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কুরায়শরা বদর যুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবী (সা)-র সামরিক প্রজ্ঞা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে, একজন কামেল পথ-প্রদর্শক ও পূত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসাবেও তাঁর তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমরকুশলীরাও মহানবী (সা) প্রদর্শিত রণ-নৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খৃস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ "একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, শুধুমাত্র সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সা) শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাতাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।" এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাণ্ডারসনের। ('লাইফ অফ মোহাম্মদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের সূচনা ঃ অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্তত পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযুর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল ঃ হুযুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফির বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ, যিনি তখনও মুসলমান হন নি, পাহাড়ের পেছন দিক

থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রু সৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারোজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযুর স্বয়ং আহত। পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই বাকী ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবীগণ জানতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে---যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

ওহুদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরায়শরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্য নারীদেরও সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সা) দেখলেন, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ঃ

ان تقبلوا نعانق : ونفرش النمارق
او تدبروا نفارق : فراق وامق

অর্থাৎ যুদ্ধে অনড় থাকলে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করবো এবং নরম শয্যা বিছিয়ে দেবো। আর যদি পশ্চাদপসরণ কর, তবে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবো।

এ সময় নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

اللهم بك اصول وبك اقاتل حسبى الله ونعم الوكيل ٥

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দীনের জন্যই লড়াই করি। আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট---তিনি উত্তম অভিভাবক।" এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

২. দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্ম-নিবেদনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নযীর ইতিহাসে দুর্লভ। হযরত আবূ দাজানা (রা) নিজ দেহ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হচ্ছিল। হযরত তালহা (রা)-ও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। হযরত আনাস (রা)-এর চাচা আনাস ইবনে নসর (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কাফির বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ (রা)-কে পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন ঃ সা'দ কোথায় যাচ্ছ ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি ! একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন। —(ইবনে কাসীর)

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মাত্র এগার জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত তালহা (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কুরায়শ্ সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কে এদের প্রতিরোধ করবে? হযরত তালহা (রা) বলে উঠলেন ঃ আমি, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! অন্য একজন আনসার সাহাবী বললেন ঃ আমি হাযির আছি। মহানবী (সা) আনসারকে অগ্রসর হতে অদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রা) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহানবী (সা) এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহা (রা)-র বাসনা পূর্ণ হলো না। এভাবে সাতবার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা (রা) প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তাঁরা শহীদ হয়ে যেতেন।

বদর যুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তবুও পরাজয় বরণ করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয় বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, বিজয় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তাঁর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

قد جاءنى كتا بكم تستمدوننى وانى ادلكم على من هو

اعز نصرًا واحصن جندا الله عزوجل فاستنصروه - فان محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نصر فى يوم بدر فى اقل من عددكم فاذا جاءكم كتابى هذا فقاتلوهم ولا ترجعونى -

—"তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি, যাঁর সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যাঁর সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন! তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর! মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্রই তোমরা শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।"

এ ঘটনার বর্ণনাকারী বলেনঃ এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে অগণিত কাফির বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। হযরত ফারুকে আযম জানতেন, মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছেঃ

يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا -

অর্থাৎ হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসেনি।

এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ—অর্থাৎ আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয়ে যুদ্ধার্থ মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যূহে সংস্থাপিত করছিলেন।

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত কখন গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন, তা غَدَوْتَ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা।

مِنْ اَهْلِكَ এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছিল।

বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার কথা ছিল। এসব খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেলে তা পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিত। এরপর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গনের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

অর্থাৎ আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। এ দুইটি গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার কোনটিই তাঁর অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর অজ্ঞাত নয়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا—অর্থাৎ তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যটি তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জামের ওপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ওপরেই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার।

'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সূফী বুযুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্য গর্ব না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গনে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরী করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে-কিরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সা) স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ্‌ তা'আলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই করে। পক্ষান্তরে অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে---যাতে মুসলমানরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ---অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান ঃ মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর।

তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। এখানেই তওহীদ ও শিরকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরী ১৭ই রমযান মোতাবেক ৬২৪ খৃস্টাব্দের ১১ই মার্চ শুক্রবার। এটি বাহ্যত একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন---এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ---অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে।

সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর ওপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ — অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৈর্য ও খোদাভীতিকে প্রতিকার হিসাবে বর্ণনা করেছে। বলা বাহুল্য, এ দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্র প্রতি ভয় এই দুই বিষয়ের উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্র প্রতি ভয়-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓى ۙ إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ
فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾
وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ
الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

(১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনগণকে—'তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন! (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।

(১২৬) বস্তুত এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আনতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফিরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন—যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে বদরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে এরই কিছু বিবরণ ও ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ থেকে اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য তখন হয়েছিল যখন আপনি (হে মুহাম্মদ) মুসলমানদের বলছিলেন ঃ তোমাদের (মনোবল দৃঢ় করার) পক্ষে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন—যাদের (এ কারণেই আকাশ থেকে) নাযিল করা হবে। (এতে বোঝা যায় যে, তাঁরা উচ্চস্তরের ফেরেশতা হবেন। নতুবা পৃথিবীস্থিত ফেরেশতাদেরও এ কাজে লাগানো যেতো। (রূহুল-মা'আনী) অতঃপর এ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেন ঃ) হ্যাঁ, (কেন যথেষ্ট হবে না। অতঃপর সাহায্য আরও বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াদা করে বলা হয়েছে সংঘর্ষের সময়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদাভীতিতে অটল থাক (অর্থাৎ আনুগত্য বিরোধী কাজে লিপ্ত না হও,) এবং তারা আকস্মিক তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, (যাতে স্বভাবতই কোন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পৌঁছা কঠিন। তবে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার বিশেষ চিহ্নিত ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। সাধারণ যুদ্ধে নিজ নিজ সেনাদলের পরিচয়ের জন্য যেমন বিশেষ চিহ্ন ও পোশাক থাকে। অতঃপর এ সাহায্যের রহস্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদের দ্বারা) উপরোক্ত সাহায্য শুধু এজন্য করেছেন, যাতে তোমাদের (বিজয়ের) সুসংবাদ হয় এবং এ দ্বারা তোমাদের অন্তর সুস্থির হয়। সাহায্য (ও প্রাধান্য) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে—যিনি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। (পরাক্রান্ত হওয়ার কারণে এমনিতেও জয়ী করতে পারেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী হওয়ার কারণে জ্ঞানের দাবী মোতাবেক বাহ্যিক উপায়াদি সরবরাহ করেন। এ পর্যন্ত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার রহস্য বর্ণিত হলো।

অতঃপর মুসলমানদেরকে এ বিজয় কেন দেওয়া হলো, তার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে) যাতে তিনি কাফিরদের একটি দলকে নাস্তানাবুদ করে দেন। (এ কারণেই সত্তর জন কাফির সরদার নিহত হয়েছিল) অথবা তাদেরকে (অর্থাৎ কিছু সংখ্যককে) লাঞ্ছিত করে দেন অতঃপর তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়। (অর্থাৎ এতদুভয়ের একটি হবে। উভয়টি হলে আরও উত্তম। কার্যক্ষেত্রে উভয়টি হয়েছিল। সত্তর জন কাফির সরদার নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অবশিষ্টরা অকৃতকার্য অবস্থায় পলায়ন করেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য ঃ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণত কওমে-লূতের বস্তী একা জিবরাঈল (আ)-ই উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফিরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কোরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া। আয়াতের শব্দ اِلَّا بُشْرٰى এবং لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ —অস্থির হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়ম মাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেওয়া।

আরেকটি পন্থা, কোন-না-কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে এ কথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এ সব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ—আয়াতের এক তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে

আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের ওপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। ---(হাকেম)

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈল (আ)-এর আওয়াজও শুনেছেন যে, তিনি اقدم حيزوم বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। ---(মুসলিম)

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেওয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো কখনো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফিরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এ বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গোনাহ্ মিশ্রভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্য হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি ? উত্তর এই যে, সূরা আন্‌ফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয় অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা যত, তত সংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

--যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে---মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটি এই ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবত এই যে, বদরে মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে।—(রূহুল মা'আনী) পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলমানদের তিন গুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়—যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশী হয়ে যায়।

অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হয়। শর্ত ছিল দুইটি ঃ (এক) মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ ভীতির উচ্চস্তরে পৌঁছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ—এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নিচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নিচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে ? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করেন। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফিরের জন্য বদ দোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ থেকে غَفُورٌ رَحِيمٌ পর্যন্ত। হে মুহাম্মদ! কারও মুসলমান হওয়া ও কাফির থাকার ব্যাপারে আপনার নিজের কোন দখল নেই—জানার দখল হোক অথবা সামর্থ্যের। এগুলো সবই আল্লাহ্র জ্ঞান ও অধিকারের আওতাভুক্ত। আপনার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি হয় (অনুগ্রহের) দৃষ্টি দান করবেন (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার তওফীক দেবেন। তখন আপনার ধৈর্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে) না হয় তাদেরকে (দুনিয়াতে) কোন শাস্তি দেবেন। (তখন ধৈর্য মনের শান্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে শাস্তিদান মাত্রও অন্যায়

নয়।) কারণ, তারা বড়ই জুলুম করছে। (এখানে জুলুমের অর্থ কুফর ও শিরক। যেমন إن الشرك لظلم عظيم আয়াতে শিরককে বড় জুলুম বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও জোরদার করা হয়েছে।) যা কিছু নভোমণ্ডলে ও যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন। এতে সে ক্ষমার অধিকারী হয়)। এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সামর্থ্য হয় না। ফলে সে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করে)। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই ক্ষমা করা আশ্চর্য নয়। কেননা, তাঁর দয়াই প্রবল)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

(১৩০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার। (১৩১) এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না (অর্থাৎ গ্রহণ করো না, মূলধন থেকে) কয়েক গুণ বেশী (করে)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর---আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (অর্থাৎ জান্নাত ভাগ্যে জুটবে এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাবে) এবং সেই আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা (প্রকৃতপক্ষে) কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (সুদ ইত্যাদি হারাম কার্য থেকে বেঁচে থাকাই আগুন থেকে বেঁচে থাকার উপায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً কয়েক গুণ বেশ, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারের সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে---যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা,

সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

(১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহিযগারদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (সানন্দে) আল্লাহ্ ও (তাঁর) রসূলের আনুগত্য কর; আশা করা যায়, তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে) তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত হও; (উদ্দেশ্য এই যে, এমন সৎকর্ম অবলম্বন কর, যার কারণে পালনকর্তা তোমাদের ক্ষমা করেন এবং তোমরা জান্নাত লাভ কর। জান্নাতটি এমন যে,) যার বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত (তা অবশ্য বেশীও হতে পারে। বাস্তবে বেশী বলেই প্রমাণিত)। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে পরহিযগারদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক---প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি?

দুই---আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহিযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না; বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার রহস্য ঃ প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -এ বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণা লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রসূল (সা)-এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআনের আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেন, সবই আল্লাহর নির্দেশে বলেন---নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। এক আয়াতে আছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوحٰى

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না ; বরং তাঁর সব কথাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। সারমর্ম এই যে, রসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য---এ থেকে পৃথক কিছু নয়। সূরা নিসার ৭৯তম আয়াতে এ কথাই সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

---অর্থাৎ যে রসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করে।

অতএব প্রশ্ন হয় যে, তাই যদি হবে, তাহলে এ দুইটি আনুগত্যকে সমগ্র কোরআনে চিরাচরিত রীতি হিসাবে পৃথক পৃথক বর্ণনা করার উপকারিতা কি?

এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জগতের পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি গ্রন্থ এবং একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। কোরআন পাকের আয়াতসমূহ যেভাবে এবং যে ভঙ্গিতে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি রসূলের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষকে বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন।

তৃতীয়ত, তিনি কোরআনের বিষয়বস্তু মানুষকে শিক্ষা দেবেন এবং এর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন। এ ছাড়া মানুষকে হিকমতের শিক্ষা দেবেন। এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ○

এতে বোঝা যায় যে, শুধু কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই রসূলের কর্তব্য নয় ; বরং কোরআন শিক্ষা দেওয়া এবং তার বিশ্লেষণ করাও তাঁরই দায়িত্ব। আর একথাও জানা যায় যে, তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিগণ ছিলেন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী

আরব। তাদেরকে কোরআন শিক্ষা দানের অর্থ শুধু শব্দের আভিধানিক অর্থ বলে দেওয়া কিছুতেই নয়। কেননা, আভিধানিক অর্থ তাদের অজানা ছিল না। বরং এ শিক্ষাদান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কোরআন পাক যেসব নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, তিনি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এমন ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, যা কোরআনের ভাষায় নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে জাগ্রত করবেন। إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদাহরণত কোরআন পাক অসংখ্য জায়গায় শুধু أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

(নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও) বলে বক্তব্য শেষ করেছে। নামাযের কিয়াম, রুকু ও সিজদা কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করলেও তা অস্পষ্ট। এগুলোর ধরন উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) স্বয়ং এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসব আরকান বিস্তারিতভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যাকাতের বিভিন্ন নেসাব, প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, কোন্ মালে যাকাত ওয়াজিব, কোন্ মালে ওয়াজিব নয়, নেসাবের পরিমাণে কতটুকু অংশ যাকাত-মুক্ত---এসব বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে দান করেছেন এবং ফরমান আকারে লিপিবদ্ধ করিয়ে সাহাবায়ে কিরামের হাতে সোপর্দ করেছেন।

কোরআন পাক এক আয়াতে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ---তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

এখন প্রচলিত কাজ-কারবার কেনা বেচা ও ইজারার মধ্যে কোন্‌টি অন্যায় ও অবিচারমূলক এবং কোন্‌টিতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়---এসব বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা) খোদায়ী নির্দেশে উম্মতকে বলে দিয়েছেন। শরীয়তের অন্য সব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত এসব বিবরণ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় কোন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কোন ধোঁকা খাওয়া অবাস্তব নয় যে, এসব বিবরণ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়, তাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে এগুলো পালন করা জরুরী নয়। এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র কোরআনে বারবার স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূলের আনুগত্যকেও অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন। রসূলের আনুগত্য বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য হলেও বাহ্যিক আকার ও বিশদ বিবরণের দিক দিয়ে কিছুটা স্বতন্ত্রও। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বারবার জোরের সাথে বলে দিয়েছেন

যে, রসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন তাও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মনে করে পালন কর--- কোরআনে তা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত থাকুক বা না থাকুক। এ প্রশ্নটি শুধু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধোঁকার কারণই নয়; বরং ইসলামের শত্রুদের জন্যও একটি হাতিয়ার ছিল। তারা এ দ্বারা ইসলামের মূলনীতিতে অনর্থ সৃষ্টি করে মুসলমানদের ইসলামের বিশুদ্ধ পথ বিচ্যুত করতে পারতো। এ কারণে কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি শুধু 'রসূলের আনুগত্য' শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করেনি; বরং বিভিন্ন ভঙ্গিতে উম্মতের সামনে তুলে ধরেছে। উদাহরণত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে গ্রন্থ শিক্ষাদানের সাথে হিকমত শিক্ষাদান যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তাও মুসলমানদের অবশ্য পালনীয়। 'হিকমত' শব্দ দ্বারা তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে---তিনি অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মর্ম, লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করবেন।

কোথাও ইরশাদ হয়েছে : مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا---অর্থাৎ রসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। এসব ব্যবস্থা এ জন্য করা হয়েছে, যাতে আগামীকাল কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা শুধু কোরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট হয়েছি। যা কোরআনে নেই, তা পালন করতে আমরা আদিষ্ট নই। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝে নিয়েছিলেন যে, কোন এক যুগে এমন লোকও পয়দা হবে যারা রসূলের শিক্ষা থেকে গা বাঁচানোর জন্য দাবী করে বসবে যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব কোরআনই যথেষ্ট। তাই এক হাদীসে তিনি পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

لا الفينّ احدكم مُتّكئًا على اريكته يأتيه الامر من امرى مِمَّا أَمَرْتُ بِهٖ اونهيتُ عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه -

অর্থাৎ আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই যে, সে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসে আমার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে এ কথা বলে বসে যে, আমরা এসব জানি না; আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে যা পাওয়া যায় আমরা তা-ই পালন করবো।---(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ)

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বারবার রসূলের আনুগত্যের উল্লেখ, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূল-প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ এগুলো

সব একটিমাত্র আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। তা এই যে, যাতে কেউ হাদীসের ভাণ্ডারে রসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণিত· বিস্তারিত বিধি-বিধানকে কোরআন থেকে পৃথক এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে ভিন্ন মনে করে অস্বীকার করে না বসে। প্রকৃতপক্ষে তা কোরআন থেকে পৃথক নয়।

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

---তাঁর উক্তি আল্লাহ্রই উক্তি---যদিও তা আল্লাহ্র বান্দার মুখ থেকে নিসৃত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', আনাস ইবনে মালেক 'নামাযের প্রথম তকবীর', সায়ীদ ইবনে জুবায়ের 'ইবাদত পালন', যাহ্হাক 'জিহাদ' এবং ইকরামা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক—এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ---যে কাজের দৌলতে আল্লাহ্ একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তা অর্জন করার বাসনা করো না;---বলে অন্যের অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণত শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুযুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হিকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নেই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা শুধু এক

আয়াতে নয়—বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ পুণ্যার্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এই জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ত্রুটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্য হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل احد الجنة عمله قالوا ولا انت يارسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد نى الله برحمته -

—"সততা ও সত্য অবলম্বন কর। মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো ঃ আপনাকেও নয় কি ইয়া রসূলাল্লাহ্! উত্তর হলো ঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।"

মোট কথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎ কর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব, সৎ কর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহ্র ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ না করে مغفرة من ربكم বলা হয়েছে। 'প্রতিপালকত্ব' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এদের সাথে তুলনা করে

যেন বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেওয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়—এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীরে-কবীরে বলা হয়েছে ঃ

قال ابو مسلم ان العرض هنا مايُعرض من الثَّمَنِ فى مقابلة المبيع اى ثمنها لو بيعت كثمن السماوات والارض والمراد بذٰلك عظم مقدارها وجلالة خطرها وانها لايسا ويها شيئٌ وان عَظُمَ -

—"আবূ মুসলিম বলেন ঃ আয়াতে عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবিলায় মূল্য হিসাবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয়, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ اعدت للمتقين অর্থাৎ—জান্নাত মুত্তাকিগণের জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার যমীন।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا
فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا
عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ
مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ
وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَٰذَا بَيَانٌ
لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

(১৩৪) যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে হজম করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের জন্য কোন মন্দ কাজ করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের অতীত হয়েছে অনেক বিধানাবলী। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে, তাদের জন্য উপদেশবাণী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে (সর্বাবস্থায় সৎ কাজে) ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে (ভুলত্রুটিতে) ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এমন সৎকর্মশীলদের (যাদের মধ্যে এসব গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তাদেরকে) ভালবাসেন। (উল্লিখিতদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্তরের মুসলমান এমনও আছে) যারা (অন্যের প্রতি জুলুম হয়, এমন কোন) অশ্লীল কাজ করলে অথবা (কোন গোনাহ্ করে ফেললে বিশেষভাবে) নিজের ক্ষতি করলে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব ও আযাবকে) স্মরণ করে, অতঃপর স্বীয় গোনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (অর্থাৎ ক্ষমার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্যের ওপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকেও ক্ষমা নেয়। বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে গোনাহ্ হলে, এতে এর প্রয়োজন নেই। তবে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে)। আর আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে যে গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করবে? (হকদারদের ক্ষমা করা প্রকৃত ক্ষমা নয়। কারণ তারা শাস্তি থেকে বাঁচাবার অধিকার রাখে না। প্রকৃত ক্ষমা একেই বলা হয়)। এবং তারা স্বীয় কর্মের জন্য হঠকারিতা করে না এবং তারা (এ সব বিষয়) জানেও (যে, আমরা অমুক গোনাহ্ করেছি, আমাদের অবশ্যই তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা কর্মসমূহও সংশোধন করে নেয় এবং বিশ্বাসও ঠিক রাখে)। তাদের পুরস্কার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং (বেহেশতের) এমন উদ্যানসমূহ, যাদের (বৃক্ষ ও গৃহের) তলদেশ দিয়ে ঝরনা প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ ক্ষমা ও জান্নাত অর্জনের নির্দেশ ছিল। মাঝখানে

এর উপায় বর্ণিত হয়েছে এবং পরিশেষে তা দান করার ওয়াদা করা হয়েছে। এটা) কি চমৎকার প্রতিদান এসব কর্মীদের! (কর্ম হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা ও সুবিশ্বাস। ক্ষমা প্রার্থনার ফলশ্রুতি আনুগত্য)। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা (পন্থার লোক) অতিক্রান্ত হয়েছে, (তাদের মধ্যে মুসলমান ও কাফির সবাই ছিল এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরিণামে কাফিররাই ধ্বংস হয়েছে। তোমরা যদি তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে চাও, তবে) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখে নাও যে, মিথ্যারোপকারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) পরিণাম কিরূপ হয়েছে? (অর্থাৎ তারা ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ — وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ইত্যাদি)। এটা (উল্লিখিত বিষয়বস্তু) মানুষের জন্য যথেষ্ট বর্ণনা (এতে চিন্তা করলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে) এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ (অর্থাৎ তারাই হেদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করে। (বস্তুত) অনুরূপ আমল করাই হেদায়েত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণত কোরআন পাক স্থানে স্থানে সৎ লোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে! কোথাও صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দীনের সরল বিশুদ্ধ পথে যাঁরা চলেছেন তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ— উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মুত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চ স্তর বিধৃত করে সৎ লোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে 'হকুকুল' ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র হক) বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহ্‌র অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ওপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নেই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নেই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। তাঁর ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতাও বটে। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়া ও দানের দরবার থেকে এক নিমেষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে। হকুকুল-ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজে সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ত্রুটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যোগাযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধও শান্তি সখ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ---অর্থাৎ মুত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। সচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা

ব্যয় করার যে মর্তবা, আল্লাহ্‌র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপর দিকে আয়াতে নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবত এর বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব, প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হল এই যে বিশ্বাসী, আল্লাহ্-ভীরু এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তাঁরা সচ্ছলই হোন কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি আঙুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না। বর্ণিত আছে যে, জনৈক মনীষী একবার একটি পিয়াজ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة - وردوا السائل ولو بظلف شاة

অর্থাৎ খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর এবং ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না, একটি ছাগলের খুর হলেও তাকে দান কর।

তফসীরে-কবীরে ইমাম রাযী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সদকা দানে উৎসাহ দান করলে যাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, তারা তা-ই দিয়ে দিল। জনৈক ব্যক্তি খেজুরের ছাল নিয়ে এল এবং বলল ঃ আমার কাছে আর কিছু নেই। অতঃপর তাই দান করা হল। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দান করার মত কিছুই নেই। তবে আমি স্বীয় সম্মানই দান করলাম। ভবিষ্যতে কেউ আমাকে হাজার মন্দ বললেও আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা ও সাহাবায়ে-কিরামের কার্যাবলী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় শুধু ধনী ও বিত্তশালীদের ভূমিকা নয়—দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে দরিদ্ররাও এ মহান গুণ অর্জন করতে চাইলে তাতে কোন বাধা নেই।

আল্লাহ্‌র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় ঃ আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন يُنفِقُونَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে,

তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ-সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত কেউ যদি তার সময় কিংবা শ্রম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তফসীরে-কবীর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য ঃ এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না। এ অর্থে কবি জাফর শাহ্ দেহলভীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি চমৎকার বটে ঃ

ظفر آدمی اسکو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

অতঃপর আল্লাহ্-ভীরুদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ ও লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ তাদের কষ্ট দিলে তারা তার প্রতি ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয় না এবং ক্রোধবশে প্রতিশোধও গ্রহণ করে না। শুধু তাই নয়, অতঃপর তারা মনেপ্রাণে ক্ষমাও করে দেয় এবং ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হয় না---কষ্টদাতার প্রতি অনুগ্রহও করে। এ যেন এক গুণের ভেতরে তিন গুণ ঃ স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করা, কষ্টদাতাকে ক্ষমা করা, অতঃপর তার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা। আয়াতে এ তিনটি গুণই উল্লেখিত হয়েছে।

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থাৎ যারা ক্রোধ সংবরণ করে, অপরের ত্রুটি মার্জনা করে বস্তুত আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।

ইমাম বায়হাকী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাযি আল্লাহু আনহুর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হুসাইনের এক বাঁদী একদিন তাঁকে ওযু করানোর সময় হঠাৎ পানির পাত্র হাত থেকে ফসকে গিয়ে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর ওপর পড়ে যায়। এতে তাঁর সব কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। এমতাবস্থায় রাগান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক! বাঁদী বিপদের আশংকা করে তৎক্ষণাৎ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ আয়াতটি পাঠ করল। আয়াতটি শোনামাত্রই নবীবংশের বুযুর্গ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর ক্রোধানল একেবারে নিভে গেল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর বাঁদী দ্বিতীয় বাক্য وَالْعَافِيْنَ

عَنِ النَّاسِ পাঠ করল। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোকে মাফ করে দিলাম। বাঁদীটি ছিল অত্যন্ত চতুর। সে অতঃপর তৃতীয় বাক্যটিও শুনিয়ে দিলঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ---যাতে প্রকারান্তরে অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। এ বাক্যটি শুনে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা) বললেনঃ যাও আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। ---(রূহুল-মা'আনী)

অপরের দোষত্রুটি মার্জনা করা মানব চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। আখেরাতে এর প্রতিদানও অনেক বড়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে দাঁড়িয়ে যাও। তখন ঐসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা দুনিয়াতে অপরের অত্যাচার-উৎপীড়ন ক্ষমা করেছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

من سرّه ان يُّشرف له البنيان وتُرْفع له الدرجات فَلْيَعْفُ عن من ظلمه ويُعْطِ مَنْ حَرَمَهٗ وَيَصِلُ من قطعهٗ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জান্নাতে তার সুউচ্চ প্রাসাদ এবং মর্যাদা কামনা করবে, তার উচিত যে অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করা, যে তাকে কখনও কিছু দেয় না, তাকে বখশিশ ও উপঢৌকন দেয় এবং যে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে মেলামেশা করে।"

কোরআন পাক অন্য এক আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় অন্যায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করার মহান চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে এবং বলেছে যে, এর বদৌলতে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়। বলা হয়েছেঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝

অর্থাৎ---"মন্দকে অনুগ্রহের দ্বারা প্রতিরোধ কর। এরূপ করলে যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমনি উচ্চ পর্যায়ের চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিলঃ

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك

অর্থাৎ "যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে মেলামেশা রাখুন।

যে আপনার প্রতি জুলুম করে, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। যে আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শান তো অনেক উর্ধ্বে। তাঁর শিক্ষার বরকতে আল্লাহ্ তাঁর অনুসারী ভক্তদের মধ্যেও এ চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের ইতিহাস এ জাতীয় ঘটনায় ভরপুর।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-কে জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালিগালাজ করে। তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং তাকে কিছুই বললেন না। ঘরে ফিরে আসার পর একটি খাঞ্চায় যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা রেখে তিনি সে ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দরজার কড়া নাড়তেই লোকটি বের হয়ে এলো। তিনি স্বর্ণমুদ্রার খাঞ্চাটি তার সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন ঃ আজ আপনি আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। স্বীয় পুণ্য সব আমাকে দান করেছেন। এ অনুগ্রহের প্রতিদানে এ উপঢৌকন পেশ করছি। গ্রহণ করুন। লোকটির অন্তরে ইমাম সাহেবের এ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে চিরতরে তওবা করে ইমাম সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। এরপর সে ইমাম সাহেবের সংসর্গে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগল এবং পরিশেষে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন বড় আলিমের মর্যাদা লাভ করল।

অতঃপর আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কখনও মানবিক দুর্বলতাবশত তাদের দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার কঠোর সংকল্প করে। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

এতে এক নির্দেশ এই যে, গোনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার কারণ। এ কারণে গোনাহ্ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং যিকিরে মশগুল হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, পাপ মার্জনার জন্য দুটি বিষয় জরুরী। এক---বিগত পাপের জন্য অনুতাপ করা এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা। দুই---ভবিষ্যতে এ পাপের ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কোরআন-নির্দেশিত মহান চরিত্র দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন ॥

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۭ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاۗءَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

(১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান—কারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফির-দেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, পরিণামে কাফিররাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি। যদিও তোমরা এখন নিজ দোষে পরাজিত হয়েছ; কিন্তু ঈমানের দাবী মোতাবেক তাকওয়া-পরহিযগারীতে অটল থাকলে পরিশেষে কাফিররাই পরাজিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (এখন পরাজিত হয়েছ, তাতে কি?) সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখ করো না। অবশেষে তোমরাই জয়ী হবে—যদি তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাসী হও (অর্থাৎ বিশ্বাসের

দাবীতে অটল থাক)। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে (যেমন ওহুদে লেগেছে,) তবে (তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এতে কতিপয় রহস্য রয়েছে। একটি এই যে,) সেই সম্প্রদায়েরও (অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদেরও) তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (বিগত বদর যুদ্ধে তারাও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আর আমার নীতি হলো এই যে,) আমি এ দিবসগুলোকে (অর্থাৎ জয়-পরাজয়ের দিনগুলোকে) মানুষের মধ্যে পরিক্রমণ করাই। (অর্থাৎ কখনও এক সম্প্রদায়কে বিজয়ী ও অপর সম্প্রদায়কে পরাজিত করে দেই এবং কখনও এর বিপরীত করে দেই। এ নীতি অনুযায়ীই তারা গত বছর পরাজিত হয়েছিল এবং এবার তোমরা পরাজিত হয়েছ। দ্বিতীয় রহস্য এই যে,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন; (কেননা, বিপদের মধ্য দিয়েই খাঁটি লোকদের পরীক্ষা হয়। তৃতীয় রহস্য এই যে,) যাতে তোমাদের কিছু সংখ্যককে শহীদ করে নেন। (অবশিষ্ট রহস্যগুলো পরে বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে 'প্রাসঙ্গিক বাক্য' হিসাবে বলা হচ্ছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম (কুফর ও শির্ক)-কারীদের ভালবাসেন না। কাজেই মনে করো না যে, ভালবাসার পাত্র হওয়ার কারণে তাদের জয়ী করা হয়েছে। কখনই নয়। চতুর্থ রহস্য এই যে,) যাতে বিশ্বাসকারী-দেরকে (গোনাহ্র) ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন (কেননা, বিপদাপদ দ্বারা চরিত্র ও কাজকর্ম বিধৌত হয়ে যায়। পঞ্চম রহস্য এই যে,) যাতে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কেননা, জয়লাভে সাহসী হয়ে তারা পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে)। শোন, তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে (বিশেষভাব) প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এখনও (প্রকাশ্যভাবে) তাদের দেখেন নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে (যথেষ্টভাবে) জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে ধৈর্য ধারণ করে? তোমরা তো মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (শহীদ হয়ে) মরে যাবার (খুব) বাসনা করতে। অনন্তর (বাসনা অনুযায়ী) একে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণসমূহকে) খোলা চোখে দেখে নিয়েছ। (এখন মৃত্যুকে দেখে কেন পলায়ন করতে লাগলে? মৃত্যু কামনা কেন ভুলে গেলে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। এক—রসূলুল্লাহ্ (সা) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়নি। কেউ বলতো: আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। দুই—খোদ নবী

করীম (সা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তিন---মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য ; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সাবিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক—অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। দুই---এ আশংকা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অংকুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

অর্থাৎ 'ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না। এবং অতীতের জন্যও বিমর্ষ ও বিষণ্ণ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার ওপর ভরসা রেখে রসূল (সা)-এর আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কিরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি, প্রভাব ও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

এ আয়াতের পর ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত

হয়েছে। এক বছর পূর্বে তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল। তাই কোরআন বলে ঃ

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ "তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে ; আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।"

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্য-পন্থীদের হতোদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপন্থীরাই জয়যুক্ত হবে।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৪) আর মুহম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সওয়াব দান করবেন। (১৪৫) আর আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না—সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে—যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে—আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুহাম্মদ (সা) রসূল বৈ তো নন (আল্লাহ্ তো নন যে, তাঁর নিহত হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ সম্ভবপর নয়)। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। (এমনিভাবে তিনিও একদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবেন)। অতএব, যদি তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় অথবা তিনি শহীদ হয়ে যান, তবে তোমরা কি (জিহাদ অথবা ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে? (যেমন, এ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল এবং মুনাফিকরা ধর্মত্যাগে উৎসাহিত করছিল?) যে কেউ (জিহাদ অথবা ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি করবে না (বরং নিজের কপালেই কুঠারাঘাত করবে)। আল্লাহ্ সত্বরই কৃতজ্ঞদের (উত্তম) প্রতিদান দেবেন। (যারা সংকটমুহূর্তে আল্লাহ্র নিয়ামতরাজি স্মরণে রেখে আনুগত্যে অটল থাকে। কিয়ামতে সত্বরই সাক্ষাৎ হবে। কেননা, কিয়ামত রোজই নিকটবর্তী হচ্ছে। এছাড়া কারও মৃত্যুতে এতটুকু অস্থির হওয়াও অর্থহীন। কেননা, প্রথমত) আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভবপর নয় (স্বভাবগতভাবে হোক অথবা যুদ্ধের জন্যই হোক আল্লাহ্র হুকুমেই যখন মৃত্যু হবে, তখন তাতে অবশ্যই সম্মত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত যখন কারও মৃত্যু আসেও, তবে তা) এভাবে যে, তার নিদিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ থাকে। (এতে ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অনর্থক বৈ নয়। সময় এলে মৃত্যু অবশ্যই হবে এবং সময়ের পূর্বে কখনও হবে না। এছাড়া মৃত্যুভয়ে পলায়ন করার ফলই বা কি? এছাড়া তো নয় যে, পৃথিবীতে আরও কিছু দিন জীবিত থাকা যাবে। অতএব, এর ফলাফলও শুনে নাও); যে ব্যক্তি (স্বীয় কাজকর্মে) জাগতিক ফল কামনা করে, আমি তাকে (আমার ইচ্ছা হলে) জগতের অংশ প্রদান করি (এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই)। আর যে ব্যক্তি (স্বীয় কাজকর্মে) পারলৌকিক ফল কামনা করে (উদাহরণত পরকালের সওয়াব লাভের একটি কৌশল মনে করে সে জিহাদের ময়দানে অটল থাকে), আমি তাকে পরকালের অংশ (কর্তব্য মনে করে) প্রদান করব। আমি অতি সত্বর (এমন) কৃতজ্ঞদের (উত্তম) প্রতিদান দেব (যারা স্বীয় কাজকর্মে পরকালে নিয়ামত কামনা করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই কোরআন পাক সরা আলে-ইমরানের চার-পাঁচ রুকূ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলী অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যত পাকাপোক্ত করার জন্যও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হুযূর (সা)-এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্য কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

বিষয়টি এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশ বিশেষ। ইসলামী মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খৃস্টান ও ইহুদীরা আক্রান্ত হয়েছিল! খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ভালবাসা ও মাহাত্ম্যকে ইবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে নিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে-কিরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও সবার পক্ষে সহজ নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহব্বতে যে সাহাবায়ে-কিরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁদের আত্মনিবেদন ও ইশকে-রসূলের খবর যাঁরা কিছুটা রাখেন একমাত্র তাঁরাই তাঁদের সে সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারেন।

এসব আশেকানে-রসূলের কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁদের অনুভূতি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন! বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা বিরাজ করছে, বিজয়ের পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের পা উপড়ে যাচ্ছে; এমনি সংকট মুহূর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টাও অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তিনিও তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন! এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল এই যে, সাহাবায়ে-কিরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলো। এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয়-ভীতির পরিণতি ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রসূলের সাহাবীদের এমন পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্য আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার কারণে সাহাবীদের এমন কঠোর ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে ধর্ম, ইবাদত ও জিহাদ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি চিরজীবী ও সদা প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা)-র মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণত্ব কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে-কিরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ..... ----অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) একজন রসূল

বৈ তো নন---তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। যদি তিনি তিরোধান করেন অথবা তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়, তবে তোমরা কি পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে যায়, সে আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট করে না। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করেন।

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের ওপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুযুর (সা)-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কিরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা---যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে হুযুর (সা) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্য সত্যই যখন তাঁর ওফাত হবে, তখন আশেকানে-রসূল যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। হুযুর (সা)-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তিলাওয়াত করেই তাঁদের প্রবোধ দেন। ফলে তাঁরা প্রকৃতিস্থ হয়ে যান।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময়---সবই নির্ধারিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

উপসংহারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, ওহুদের দুর্ঘটনার অন্যতম বাহ্যিক কারণ ছিল এই যে, হুযুর (সা) যাদেরকে পশ্চাদ্দিকে গিরিপথের প্রহরায় নিযুক্ত করেছিলেন, তারা প্রাথমিক বিজয়ের সময় গনীমতের মাল আহরণের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করে অন্যান্য মুসলমানের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় আমল দ্বারা ইহকালের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে ইহকালে কিছু অংশ দান করি এবং যে পরকালের প্রতিদান কামনা করে, সে পরকালের প্রতিদান লাভ করে। আমি অতি সত্বরই কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেব।

এতে ইশারা করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল আহরণের চিন্তায় হুযুর (সা)-এর অর্পিত কাজ ছেড়ে তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়---যা শরীয়তে নিন্দনীয়। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও জিহাদের